শরদিন্দু সংখ্যা

অবসর (বিশেষ) সংখ্যা , এপ্রিল ৩০, ২০১৫

শরদিন্দুর গল্প

শেখর বসু

প্রসন্নতা, সরসতা এবং নানা বিষয়ে স্বাভাবিক আগ্রহ যে লেখক-মানুষটির আছে, তাঁর লেখায় ব্যক্তিচরিত্রের ওই গুণগুলি ধরা পড়বেই। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘গল্পসংগ্রহ’- এর গল্পগুলি পড়তে পড়তে এই কথাগুলি নতুন করে আরও একবার মনে পড়ে গিয়েছিল আমার। পৃথিবীর যে-কোনও দেশের উঁচু মানের সাহিত্যজগতে এমন দু-তিনজন লেখক থাকেন, যাঁদের সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র বা আকাশচুম্বী স্তম্ভ বলে ধরা হয় না; কিন্তু তাঁরা না থাকলে আবার বিশেষ ভাষার সাহিত্যজগতের ছবিটিও অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ছবির এই সম্পূর্ণতার জন্যে বাংলা ভাষার পাঠকরা সামান্য যে-ক’জন লেখকের কাছে অশেষ ঋণী, তাঁদের একজন হলেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাংলা সাহিত্যের জগতে এই লেখকের প্রবেশ ‘শ্রীশরদিন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল’ নামে। আগ্রহী পাঠকরা পুরনো ‘প্রবাসী’, ‘ভারতবর্ষ, ‘মাসিক বসুমতী’ ইত্যাদি পত্রিকার পাতা ওলটালে এই ‘বি এল’ বা ‘বি এ’ ডিগ্রিভূষিত অনেক লেখকের দেখা পাবেন। শরদিন্দু ওই ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যাননি, বরং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত ওই ‘ভূষণ’ এবং পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘বি এল’-এর গুরুভার থেকে তিনি মুক্ত হন। তাঁর চরিত্রের প্রসন্নতা, সরসতা এবং নানা বিষয়ের প্রতি স্বাভাবিক আগ্রহ নিজের পথটি খুঁজে নিতে সাহায্য করেছিল তাঁকে। বারট্রান্ড রাসেল বলেছেন : ‘খিদের সঙ্গে খাদ্যের যেমন সহজ সম্পর্ক, ঠিক তেমনই সহজ সম্পর্ক সরসতার সঙ্গে গোটা জীবনের।’ সরসতা শরদিন্দুর জীবন ও সাহিত্যকে কখনও ছেড়ে যায়নি।

১৩৫২ সালের প্রকাশিত ‘দন্তরুচি’ গল্পগ্রন্থের ভূমিকায় শরদিন্দু লিখেছিলেন, “এই পুস্তকের একত্রিশটি গল্পে আকারগত হ্রস্বতা ছাড়া আর কোনও ঐক্য নাই; কেবলমাত্র দৈহিক ক্ষুদ্রতার অপরাধে ইহাদের দশাও তাই।...কয়েকটি গল্পে ‘আমি’ নামক কিম্ভূত ব্যক্তি গল্পের বক্তা। এই ‘আমি’কে গ্রন্থকার মনে করিলে ভ্রম হইবে। বস্তুত এই ‘আমি’ এক ব্যক্তি নয়,—গল্পভেদে তাহাদের বয়স, চরিত্র, দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ পৃথক।”

নানা বিষয়ে, নানা প্রেক্ষাপট নিয়ে গল্প লেখার স্বভাবগত ঝোঁকটি লেখক তাঁর দীর্ঘ লেখকজীবন ধরেই লালন করে গিয়েছেন। গল্পসংগ্রহের প্রায় দুশোটি গল্পে বিষয়বৈচিত্র্য চোখে পড়ার মতো। ব্যাপক এবং বর্ণময় জীবনের নানা দিককেই তিনি স্পর্শ করে গিয়েছেন।

কী নেই গল্পসংগ্রহে? অলৌকিক, ভৌতিক, গোয়েন্দাকাহিনী, ইতিহাসভিত্তিক ও হাস্যরসাত্মক রচনা আছে। আছে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত জীবনের নানা সংকট ও আকাঙক্ষার কথা। অতীত ও ভবিষ্যৎ-জীবনের বিভিন্ন ছবি, চলচ্চিত্র ও স্বপ্নময় কাহিনীরও সন্ধান মেলে।

নানা প্রেক্ষাপট গল্পগুলিতে। কখনও এসেছে বিহারের মুঙ্গের শহর ও সংলগ্ন গ্রাম, কখনওবা মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন জনপদ। মধ্য বয়স থেকে পুনাতে স্থায়ী তাবে বসবাস করেছিলেন লেখক। ওই শহর এবং শহরের বিভিন্ন মানুষজনও নানা ভাবে এসেছে তাঁর গল্পে। কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজে পড়াশোনা করেছেন তিনি, তৎকালীন এবং পরবর্তী সময়ের কলকাতাও হয়েছে নানা গল্পের পটভূমি।

‘কল্লোল’ যুগের লেখকরা গল্পে বিষয়বৈচিত্র্য আনার কাজে উঠে পড়ে লেগেছিলেন। তাঁদের বিষয়সংগ্রহের তালিকাটি ছিল সুদীর্ঘ। এক দিকে কয়লাকুঠির জীবনবৃত্তান্ত, অচেনা বা অর্ধচেনা এলাকার বিচিত্র কাহিনী, অপর দিকে ফুটপাথের জীবন বা হা-ঘরে বেশ্যার বৃত্তান্ত। সমকালের অনেক লেখকের ওপর কল্লোলের লেখকদের প্রভাবও ছিল মারাত্মক। কিন্তু শরদিন্দু এই প্রভাব থেকে দূরে রাখতে পেরেছিলেন নিজেকে।

বিচিত্র বিষয়ের প্রতি কিছু বাঙালি লেখকের ঝোঁক অবশ্য আগেও ছিল। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর জনপ্রিয় ‘রমাসুন্দরী’ উপন্যাসে তৎকালে দুর্গম কাশ্মীরের চিত্তাকর্ষক একটি বর্ণনা দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, অপরূপ

কাশ্মীর থেকে বায়ু পরিবর্তন করে আসার পরামর্শও দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথাকে। উৎসাহী রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : "হ্যাঁ, তুমি তো ঘুরে এসেছ ওখান থেকে।"

উত্তরে মাথা চুলকে প্রভাতকুমার বলেছিলেন : "না, আমার যাওয়া হয়নি ওখানে। আমি লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে, কাশ্মীরের যাবতীয় তথ্য জোগাড় করেছি!"

জবাবে বিস্মিত রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : "অ্যাঁ! তুমি তো বড় সাঙ্ঘাতিক লোক হে!"

এ কাহিনীটি এই কারণে স্মরণ করা হল যে, শরদিন্দু তাঁর গল্পের প্রেক্ষাপট ও বিষয়বস্তু সংগ্রহের জন্য গ্রন্থাগারে ছোটেননি। ছাতা বগলে এ-গ্রাম সে-গ্রাম বা এ-পাড়া সে-পাড়া একবার ঘুরে এসেও গল্প লিখতে বসেননি। ভারতের নানা প্রান্তের জনপদের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক আগ্রহ ও কৌতূহল ছিল। নিছক গল্পের বীজ সংগ্রহের জন্যে মেলামেশা করতেন না, মানুষজনের সঙ্গে। বিচিত্র বিষয়ের গভীরে যাওয়ার ঝোঁকটি ছিল তাঁর মজ্জাগত। লেখার কলম হাতে নিলে যা উৎসারিত হত—তা আর যাই হোক, কৃত্রিম নয়।

কিন্তু মানুষটিকে স্বভাব-লেখক ভাবা ভুল হবে। তাঁর সাহিত্যরুচি গড়ে উঠেছে দেশবিদেশের সুসাহিত্য পাঠ করে। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের অত্যন্ত মনোযাগী পাঠক ছিলেন শরদিন্দু। প্রিয় লেখকদের তালিকায় ছিলেন ত্রৈলোক্যনাথ এবং পরশুরাম। নিবিষ্ট পাঠক ছিলেন মপাসাঁ, ও হেনরি এবং আর্থার কোনান ডয়েলের। শার্লক হোম্‌স তাঁর শিকড় ধরে নাড়া দিয়েছিল। হোম্‌সের ভঙ্গিতে তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় বিশ্লেষণ করে নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারত সতান্বেষী; কিন্তু ব্যোমকেশ অনুকরণের ফসল নয়, উজ্জ্বল মৌলিক সৃষ্টি। প্রভাবিত হলেও যে স্বতন্ত্র হওয়া যায়, তার প্রমাণ ব্যোমকেশ।

সুকমার রায়ের হেশোরাম হুঁশিয়ারের ছায়া পড়েছে সত্যজিতের শঙ্কু চরিত্রে, কিন্তু ওই ছায়ার মায়া কাটিয়ে শঙ্কু সম্পূর্ণ আলাদা একটি চরিত্র হয়ে উঠেছে। ডিফোর রবিনসন ক্রুসোর ছাঁচে গড়া উহসের সুইস ফ্যামিলি রবিনসন, কিন্তু দুটি উপন্যাসই স্বতন্ত্র এবং ধ্রুপদী। সাহিত্যে এমন দৃষ্টান্ত বেশ কিছু আছে।

বিশ শতকের ঘোরতর ইনটেলকচুয়াল জেমস জয়েস এক তরুণ আইরিশ লেখককে জবাবি চিঠিতে উপদেশ দিয়ে লিখেছিলেন : "তুমি মাথা নয়, হৃদয় থেকে লিখবে। ইনটেলেকচুয়ালাইজেশনের ব্যাপারটা পরে দেখা যাবে।" শরদিন্দু হৃদয় থেকে লিখেছেন, কিন্তু তাঁর সুপরিণত মস্তিষ্কও জাগ্রত থাকত সব সময়।

গল্পসংগ্রহের 'অমাবস্যা' কাহিনীটি একদা 'উত্তম মধ্যম' সংকলনে ছিল। এই গল্পটির প্রসঙ্গে লেখকের 'কিছু নিবেদন' -এর কথা স্মরণ করা যেতে পারে। শরদিন্দু লিখেছিলেন: 'অমাবস্যা' বকচ্ছপ জাতির কাহিনী। ইতিপূর্বে আরও কয়েকটি এই জাতের কাহিনী আমি লিখেছি।

"বর্তমান কালে কাহিনী রচনার দুটি প্রধান রীতি প্রচলিত আছে; এক, গল্প-উপন্যাস; দুই মঞ্চনাট্য চিত্রনাট্য। এই দুই রীতির টেকনিক; সম্পূর্ণ আলাদা। নাট্যের আবেদন চক্ষুকর্ণ দিয়ে। গল্প-উপন্যাসের আবেদন মনের কাছে; লিখিত শব্দের সাহায্যে সে মনের পটে ছবি আঁকে, চরিত্র আঁকে, ঘটনা তৈরি করে।

"কিছুদিন আগে আমার ইচ্ছা হয় এই দুই রীতিকে একত্র করে একটা নতুন রচনাশেলী তৈরি করি, যাতে গল্প-উপন্যাসের স্বাদও থাকবে আবার নাটকের প্রতুৎপন্নতাও (immediacy) অনুপস্থিত থাকবে না। 'অমাবস্যা' এই জাতের কাহিনীর সাম্প্রতিক নমুনা।"

শরদিন্দু চলচ্চিত্রে চিত্রনাট্য লেখার কাজের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন। সফল চিত্রনাট্যকার। চিত্রনাট্য রচনার এই অভিজ্ঞতাকে তিনি গল্প-উপন্যাসে সচেতন ভাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। লিখিত শব্দের সাহায্যে শুধুমাত্র মন নয়, চক্ষুকর্ণের কাছেও পৌঁছতে চেয়েছিলেন তিনি। প্রয়োগটি বেশ অভিনব। মনে হয় না, শরদিন্দুর আগে বাংলা সাহিত্যে আর কেউ সচেতন ভাবে এই দুটি রীতিকে একসঙ্গে মেশাবার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। পদ্ধতিটি পরবর্তীকালেও তেমন চর্চিত হয়নি।

অমাবস্যা গল্পটি পাঠকরা একটু সতর্ক ভাবে পড়লে চলচ্চিত্রের বিভিন্ন পরিভাষা ও প্রয়োগের কথা তাঁদের মনে পড়ে যেতে পারে। মনে হতে পারে—এখানে ক্লোজ শট, ওখানে মিড শট বা লং শট। ছবির অংশ ডিজল্‌ভ হচ্ছে কোথাও, কোথাও বা কাট্‌। ক্যামেরা টিলটিং বা প্যানিংয়ের কথাও মনে হতে পারে। বরেণ্য চলচ্চিত্রকারদের মুদ্রিত চিত্রনাট্য পড়ার সুবাদে চলচ্চিত্রের কিছু ভাষা ও প্রয়োগ সম্পর্কে পাঠকদের সামান্য কিছু ধারণা তৈরি হয়েছে। ওই ধারণার আলোয় 'অমাবস্যা' কাহিনীর নতুন মাত্রার হদিস পেতে পাবেন পাঠকরা।

গল্প শুরুর অংশটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

“দার্জিলিং কিংবা সিমলার মতো একটি শৈল-নগর। উঁচু-নিচু রাস্তা, ছবির মতো বাড়ি।

“একটি স্থান বন-জঙ্গলে ঢাকা, পাকা রাস্তা এখান পর্যন্ত এসে থেমে গেছে। পাহাড়ের ফাঁকে একটা সমতল পাথর খাদের ওপর ঝুঁকে আছে। লোকে বলে বাঘের জিভ। পাঁচ- ছয় হাত চওড়া, দশ-বারো হাত লম্বা পাখরটি যেন খাদের ওপর সেতু বাঁধতে গিয়ে এক- পা এগিয়েই থেমে গেছে।

“একদিন অপরাহ্নে এই কাহিনীর নায়িকা পুষ্পা একা এই বাঘের জিভের ওপর বসে ওনগুনিয়ে গান গাইছিল। পিছনে রাস্তার ওপর তার ছোট্ট টু-সিটার গাড়িটা রয়েছে। পুষ্পা থেকে থেকে উৎসুক চোখে পিছু ফিরে তাকাচ্ছে, মনে হয় সে কারুর জন্যে অপেক্ষা করছে।

“দূর থেকে একটি মোটরের গুঞ্জন শোনা গেল। একটি বড় গোছের গাড়ি পুষ্পার গাড়ির পাশে এসে দাঁড়াল। চালকের আসন থেকে অবতীর্ণ হলো এক কান্তিমান যুবক, নাম দীপনারায়ণ। তাকে দেখে পুষ্পার মুখে হাসি ফুটল। দীপনারায়ণ এসে পুষ্পার পাশে বসল। বেশ বোঝা যায় তারা পরস্পরের প্রতি আসক্ত।”

সিনেমার ছবির মতো এই দৃশ্যটি পাঠকের চোখের সামনে ভেসে ওঠে মুহূর্তের মধ্যে। সঙ্গে আছে লাগসই সংলাপ। ঠিক সিনেমার কায়দায় ঘটতে থাকে দ্রুত পটপরিবর্তন।

জমজমাট, এই দীর্ঘ কাহিনীটি গড়ে উঠেছে মুখ্যত পুষ্পা, দীপনারায়ণ এবং রাজমোহনকে নিয়ে। ত্রিকোণ প্রেম। সঙ্গে আছে নানা চক্রান্ত, গুলিগোলাও চলেছে। গল্পের শাখাকাহিনীতে আছে পুষ্পার পুলিশসাহেব দাদা রণধীর এবং কুচক্রী রাজমোহনের নিষ্পাপ বোন পূর্ণিমার প্রচ্ছন্ন প্রেম। ছোট-বড় আরও অনেক চরিত্র আছে কাহিনীতে, আর যা খুব বেশি করে আছে তা হল ঘটনার ঘনঘটা।

কাহিনীতে জটিল আবর্ত সৃষ্টি হয়েছে এক প্রেমিকা আর দুই প্রেমিককে নিয়ে। গোড়ার দিকে দীপ এবং রাজ—দুজনের একজন বিষের বড়ি খেয়ে বরাববের জন্যে সরে যাওয়ার খেলায় মেতেছিল। এটি অবশ্য নির্দোষ খেলা নয়। কুচক্রী রাজের চাল। কিন্তু তা ভেস্তে গিয়েছিল নাটকীয় ভাবে।

কাহিনীর এই জায়গায় আমার পরশুরামের ‘রামধন বৈরাগ্য’ গল্পটির একটি অংশের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। রম্ভার তিন প্রেমিক—বিদ্যাপতি, বিক্রম সিং এবং শ্যামসুন্দর প্রেমের সমস্যার সমাধানের জন্যে গোল টেবিল বৈঠকে বসেছিল। আলোচনার শেষ দিকে বিক্রম সিং বিদ্যাপতিকে বলল, ‘উপায় আছে। ডুয়েল লড়লে সহজেই ফয়সালা হতে পারবে। এই ধর, প্রথমে তোমার সঙ্গে শ্যামসুন্দরের লড়াই হল, তুমি মরে গেলে। তারপর শ্যাম আর আমার লড়াই হল, শ্যাম মরল। তখন আর কোনও ঝঞ্ঝাট থাকবে না, আমার সঙ্গে রম্ভার শাদি হবে।”

এটুকু মিল থাকা অবশ্য তেমন কিছুই নয়, অন্য সব দিক থেকে দুটি কাহিনী সম্পূর্ণ আলাদা গোত্রের। তবে আর একটি মিল আছে যা বেশ বড় মাপের। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসার পরে প্রতি অমাবস্যায় মধ্যরাতে ভালমানুষ দীপের অদ্ভুত এক রূপান্তর ঘটত। রাতে নানা কুকাজ করে ফিরে আসত, কিন্তু পরদিন সেসব তার আর মনে থাকত না।

এই ঘটনাটি গল্পের মধ্যে বেশ কয়েকবার ঘটেছে এবং তার সঙ্গে যা জমে উঠেছে তার নাম নাটক। গল্পের এই বিচিত্র এবং দীর্ঘমেয়াদি মোচড়ের জায়গায় এসে কোনও কোনও পাঠকের রবার্ট লুইস স্টিভেনসনের ‘দি স্ট্রেন্জ কেস অব ডক্টর জেকিল অ্যান্ড মিস্টার হাইড’-এর কথা মনে পড়ে যেতে পারে। এই মিলটুকুর কথা বাদ দিলে অবশ্য ‘অমাবসা’ ভিন্ন স্বাদের কাহিনী। গল্পের ভাষা ব্যবহার এবং কাহিনীর বুননে শরদিন্দু তাঁর স্বাভাবিক মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। লিখিত গল্প এবং সিনেমার চিত্রনাট্যের মিশ্রণের দিক থেকে বিচার করতে গেলে ভবিষ্যতের আলোচকরা গল্পটির দিকে ফিরে তাকাতে পারেন। হয়তো এই গল্পের সুবাদে নতুন একটি রীতির উদ্ভাবক হিসেবেও চিহ্নিত হবেন শরদিন্দু।

‘অমাবস্যা’র ঠিক বিপরীত প্রান্তে আছে ‘পূর্ণিমা’ নামের গল্পটি। এই গল্পের অন্যতম চরিত্র “জীবু পাগল। অন্য সময় সে সহজ মানুষ, কিন্তু পূর্ণিমাতিথিতে তাহার সুপ্ত পাগলামি সাপের মতো মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, রক্তের মধ্যে হত্যার বীজাণু ছুটাছুটি করে। আজ পূর্ণিমা।”

এই পূর্ণিমার প্রভাবেই জীবু পথে বেরিয়ে মহী নামের এক যুবককে ছুরি মেরে খুন করেছিল। ছুরি মারাব পরেই জীবুর মাথার “গরম নামিয়া গিয়াছে। সে তীরবেগে ছুটিয়া নিজের বাড়িতে ঢুকিয়া পড়িল। মহীর মৃতদেহ ফুটপাথের উপর সারারাত্রি পড়িয়া রহিল, কেহ দেখিল না। কেবল আকাশে ফাগুন পূর্ণিমার চাঁদ হাসিতে লাগিল।”

আকাশে পূর্ণিমার চাঁদের উদয় দিয়ে শুরু, তারপর এই হত্যাকাণ্ডের মধ্যেই গল্পের শেষ। বাইরের কোনও কার্যকরণ এখানে নেই। জীবুর খুন করার আকাঙক্ষা, তারপর তা মেটার পরেই গল্পের পরিসমাপ্তি।

ভূত, অলৌকিক বৃত্তান্ত, সংস্কার, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, জনশ্রুতি, লোককথা ইত্যাদি অবলম্বন করে বেশ কয়েকটি গল্প লিখেছেন শরদিন্দু। রহস্যগল্প নির্মাণে লেখকের দক্ষতা প্রশ্নাতীত। তিনি তাঁর সেই দক্ষতাকে পুরোমাত্রায় কাজে লাগিয়েছেন বর্তমান সংকলনভুক্ত 'কামিনী', 'কালো মোরগ, 'সতী', 'ধীরেণ ঘোষের বিবাহ, 'দেখা হবে', 'নখদর্পণ', 'ভূত ভবিষ্যৎ' ইত্যাদি গল্পে।

লেখক গোয়েন্দাকাহিনী ছাড়া অন্যত্র বুঝি দুষ্টের দমনে বিশ্বাসী নন। তাঁর কয়েকটি গল্পে জীবনের 'অসংস্কৃত' এবং অসামাজিক কয়েকটি দিক শিল্পের প্রয়োজনে উঠে এসেছে। এমন দুটি গল্পের নাম 'আলোর নেশা' ও 'ট্রেনে আধঘন্টা'। এই দুটি গল্পের প্রসঙ্গে লেখক তাঁর নোট্স্-এ লিখেছিলেন, "এই দুটি গল্পে আমি এমন স্থানে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি, দেবদূতেরাও যেখানে যাইতে ভয় পান।"

সেই আমলের সামাজিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে গল্প দুটির বিষয়বস্তু হয়তো কিছুটা দুঃসাহসিক; কিন্ত পরবর্তীকালের বাঙালি লেখক, পাঠক এবং দেবদূতরাও এই সব তথাকথিত নিষিদ্ধ এলাকায় ঢোকার জন্যে কোনওরকম সাহসের অভাব বোধ করেননি। গল্প দুটি বিষয়বস্তু নয়, রচনার গুণে আজও সুপাঠ্য।

বিষয়বস্তুর যেখানে কোনও ভার বা চাপ নেই, শরদিন্দু যেখানেও স্বচ্ছন্দ—বোধহয় একটু বেশিমাত্রায় স্বচ্ছন্দ। তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় বা বিষয়ের আভাস লেখার গুনে নতুন মাত্রা পেয়েছে। এমন তিনটি গল্প হল 'সন্ন্যাস', 'তা তা থৈ থৈ' এবং 'নতুন মানুষ'।

'সন্ন্যাস' গল্পের শুরুটি চমকপ্রদ। সংবাদপত্রের ব্যক্তিগত স্তম্ভে একটি বিজ্ঞাপন দেখিলাম—বাবা, মা মারা গিয়াছেন। আপনি এবার ফিরিয়া আসুন। শ্রী রামধন ঘোষ। ফুলগ্রাম। বাঁকুড়া।

"সংবাদপত্রের এই স্তম্ভটি আমার প্রিয়। রোজই পড়ি। ছেলে ম্যাট্রিক ফেল করিয়া পলায়ন করিয়াছে, পিতা বিজ্ঞাপন দিতেছেন—ফিরিয়া এস, বেশি মারিব না। এ ধরনের বিজ্ঞাপন প্রায়ই বাহির হয়। কিন্তু পুত্র পিতাকে অভয় জানাইয়া ফিরিয়া আসিতে বলিতেছেন, ইহা সম্পূর্ণ নতুন। আমার কল্পনা উত্তেজিত হইয়া উঠিল।"

এই উত্তেজিত কল্পনার ফসলটি অনবদ্য। হিমালয়ের সানুদেশে গিরিগুহায় গাঁজার মোড়ক হিসাবে ওই বিজ্ঞাপনটি পৌঁছে গিয়েছিল। সেই বিজ্ঞাপন পড়ে কূটস্থ চৈতন্যের আশেপাশে ঘোরা এক সন্ন্যাসী ধ্যানের আসন খোকে লাফ মেরে উঠে মহানন্দে নাচতে নাচতে বললেন, "বৌ! খাণ্ডার রণচন্ডী মরেছে। আমি চললাম। ঘরে ফিরে চললাম।"

স্ত্রীর ভয়ে স্বামীর দেশান্তরী বা বিপর্যস্ত হওয়া শরদিন্দুর একাধিক গল্পের বিষয়। এই প্রসঙ্গে 'আদায় কাঁচকলায়' গল্পে আরও এক ধাপ এগিয়ে লেখক লিখেছেন, "ভাগ্যক্রমে দু'জনেই বিপত্নীক।"

'তা তা থৈ থৈ' গল্পের ভোম্বলদার বয়স চল্লিশ, সুবিপুল দেহ। ছেলেবেলা থেকে মোটা বলে লজ্জায় তিনি বিয়ে করেননি। সঙ্গীতবিদ্যার ওপর মানুষটি হাড়ে হাড়ে চটা। গ্রামোফোন এবং রেডিওর ভয়ে তিনি শহর ছেড়ে এমন একটি রাস্তার ওপর বাড়ি বানিয়েছেন যেখানে দু-মাইলের মধ্যে লোকালয় নেই। কিন্তু সঙ্গীতবিদ্বেষী এই মানুষটি একদিন সুরের মায়ায় আক্রান্ত হয়ে নাচ শুরু করলেন। যে সে নাচ নয়, ম্যারাথন নাচ।

"দাদা নাচিতেছেন। লাফালাফি দাপাদাপি নাই, থুপ থুপ করিরা কুমাড়োপটাশের মতো নাচিতেছেন। নৃত্যের তালে তালে চিবুক হইতে নিতম্ব পর্যন্ত মেদ-তরঙ্গ হিল্লোলিত হইতেছে; হাত দুটি ভঙ্গিমাভরে একটু লীলায়িত হইতেছে—। কিন্তু দাদার মুখে আনন্দ নাই।"

অবশেষে রেকর্ডে 'ঠমকি ঠমকি নাচে রাই' গানটি শোনার পরে দাদার নাচ থামল এবং সঙ্গীতের মহিমা বোঝার পরে জানলেন—"গানের তুল্য জিনিস নাই, ফ্রেঞ্চ ফাউল কাটলেট ইহার কাছে তুচ্ছ।"

'নতুন মানুষ'-এর কাহিনীটিও চমকপ্রদ। "এমন আশ্চর্য ব্যাপার পূর্বে কখনও ঘটে নাই। নেপালচন্দ্রের পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া কাঁদিল না, স্রেফ বলিল, 'পেস্তা'। দ্বিতীয় কথা 'ইডলি'। তৃতীয় কথা বর্মি 'নাপ্পি'।" অত্যাশর্য এই ঘটনা ঘটার পরে সন্তানের প্রকৃত পিতৃপরিচয় নিয়ে পিতার দুর্ভাবনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। চতুর্থ শব্দ 'ল্যাংচা'। "নেপালের হৃৎযন্ত্র তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিল। যাক, তবু ছেলে বাঙলা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে।"

একজন লেখকের সব গল্প ভাল হয় না। সংকলনটিতে মধ্যম মানের বেশ কয়েকটি গল্প আছে। যেমন 'কেতুর পুচ্ছ',

‘ন্যুডিজম-এর গোড়ার কথা’, ‘নিশীথে’, ‘পতিতার পত্র’, ‘মটর মাস্টারের কৃতজ্ঞতা’, ‘কিস্টোলাল’। এই তালিকাটি আরও বড় করা যায়, কিন্তু তার দরকার নেই। একজন লেখক বেঁচে থাকেন ভাল গল্প লেখার জন্য। তেমন ভাল গল্প এই সংকলন-গ্রন্থটিতে বেশ কয়েকটি আছে।

শরদিন্দুর রসবোধ, সহজ এবং স্বতঃস্ফূর্ত। রসবোধের পরিচয় দেওয়ার জন্য লেখককে আলাদা ভাবে তোড়জোড় করতে হয়নি কোথাও। কিন্তু পাঠক হিসেবে এই সুলেখকের রসসিক্ত মনের পরিচয় দেওয়ার লোভ সংবরণ করা কঠিন। দু-চারটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

“দাদার মতো নর-পুঙ্গবকে বিবাহ করিতে সম্মত হইবে এমন তরুণী বাংলাদেশে আছে কি? দাদার দেহে যে ওজনের মেদ-মাংস আছে তাহাতে স্বচ্ছন্দে দুটা মানুষ হয়, সুতরাং দাদাকে বিবাহ করিলে দ্বিচারিণী হওয়ার আশঙ্কা। এইরূপ কলঙ্ক কোনও বাঙালীর মেয়ে বরণ করিয়া লইবে না।” (তা তা থৈ থৈ)

‘নিশিকান্তবাবুর দ্বিতীয় পক্ষ—তবে ভার্যাটি নেহাৎ তরুণী নয়, বয়স বত্রিশ-তেত্রিশ। তিনি অত্যন্ত সৌখিন এবং বন্ধ্যা, এই জন্য বাংলা সাহিত্যে তাঁহার প্রবল অনুরাগ...।” (তিমিঙ্গিল)

“তাঁহার স্ত্রী প্রথম শ্রেণীর ট্রামের পশ্চাতে দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রামের মতো সর্বদা স্বামীর অনুগামিনী ছিলেন।” (নিশীথে)

১৯৭০ সালে একটি সাক্ষাৎকারে শরদিন্দু বলেছিলেন, “ছোটগল্পটাই আমার হাতে বেশি আসে। গল্প লেখার সময় সর্বদা মনে রাখি-Brevity is the soul of wit. যাই লিখি না কেন যত্ন করে লিখতে হয়।”

লেখকের গল্পে অতিকথনের কোনও জায়গা নেই। যৎসামান্য শব্দ খরচ করে তিনি সময়ের দুস্তর ব্যবধান অতিক্রম করতে পারেন। সুদীর্ঘ ভূমিকার প্রয়োজনটুকু সারতে পারেন সামান্য কয়েকটি শব্দ খরচ করে।

‘বোম্বাইকা ডাকু’ কাহিনীর গোড়ার অংশটুকু স্মরণ করা যেতে পারে এই সূত্রে। “কয়েকদিন আগে পুনার একটি হোটেলে দহিবড়া খেতে ঢুকেছিলাম, আচারিয়ার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। প্রায় কুড়ি বছর পরে দেখা। বম্বে টকীজে আমরা একসঙ্গে ছিলাম, তারপর আচারিয়া যখন নিজের ফিল্ম কোম্পানী খুললেন তখন আমি বছর দেড়েক তাঁর সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। আমি চিত্রনাট্য লিখতাম, তিনি ছবি পরিচালনা করতেন। দু’জনেরই চেহারার বদল হয়েছে, কিন্তু চিনতে কষ্ট হল না। আচারিয়া গুজরাতি, কিন্তু শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছিলেন, পরিষ্কার বাংলা বলেন। দু’জনে দহিবড়া খেতে খেতে পুরনো কালের অনেক গল্প করলাম। অনেক পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটলাম। নানা কথার মধ্যে এক সময় তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘নর্সিং ভাই, সেই ঘটনাটা মনে আছে? ঘটনার উল্লেখ করলাম, তিনি উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন।”

পাঠক এবং তরুণ লেখকরা এই অংশটি মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ করতে পারেন। দীর্ঘ কুড়ি বছর বাদে দেখা হয়েছে দুই বন্ধুর। দু-কথায় দু’জনের পেশা ও পরিচিতি সারা হয়েছে। পুরনো দিনের দুই বন্ধুর দেখা মানেই অনেক গল্প, অনেক কাসুন্দি ঘাঁটা। বিশেষ একটি ঘটনার উল্লেখের পরেই মূল ঘটনায় চলে আসা। ঘটনার উল্লেখে উচ্চকণ্ঠের হাসি অর্থাৎ কাহিনী সম্পর্কে পাঠকের কৌতূহলও তৈরি। দীর্ঘ প্রাককথন-পর্বকে কত সামান্য কথায় ধরা যায়, তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এটি। গল্পে প্রয়োজনীয় সব তথ্যের জোগান দিয়েছেন লেখক, কিন্তু ঠাসাঠাসি করে নয়। আলগোছ, অনায়াস চাল এবং শেষ বাক্যেই গল্পের কৌতূহলী সূত্রপাত। লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য লেখক সব সময় সবচেয়ে সোজা পথটি ধরেন। কিন্তু তার জন্য ক্রমাগত চড়াই-উতরাই ভাঙা বা আগাছা পেরুনোর কষ্ট নেই। গল্পের চাল এবং চলা সমান উপভোগ্য।

‘চলচ্চিত্র প্রবেশিকা’ এবং ‘হৃৎকম্প’ রচনা দুটি সম্পর্কে আলাদা ভাবে কিছু বলা দরকার। শরদিন্দু ১৯৩৮ সালে বোম্বাইয়ে যান চাকরি নিয়ে। সেটি ছিল চলচ্চিত্রের জন্য চিত্রনাট্য লেখার কাজ। যুক্ত হয়েছিলেন বোম্বে টকিজ-এর সঙ্গে। হিমাংশু রায় ছিলেন ওই ফিল্ম প্রতিষ্ঠানের কর্তা। তাঁর স্ত্রী দেবিকারানি ছিলেন ভারতীয় সিনেমা রাজ্যের একচ্ছত্রী সম্রাজ্ঞী। স্যার রিচার্ড টেম্পল ছিলেন বোম্বে টকিজ কোম্পানির বোর্ড অব ডিরেক্টর্সের একজন সদস্য। শশধর মুখার্জি ছিলেন স্টুডিওর দু’নম্বর সাউন্ড রেকর্ডিস্ট। জ্ঞান মুখার্জি কাজ করতেন ল্যাববেটরিতে। বোম্বে টকিজের ছবি করার পদ্ধতি ছিল অন্য রকম। শরদিন্দু সিনেমার গল্পটি লিখে দিতেন ইংরেজিতে। সংলাপ-লেখক হিন্দিতে সংলাপ লিখতেন। হিমাংশু রায় লিখতেন শ্যুটিং স্ক্রিপ্ট। সেই স্ক্রিপ্ট সামনে রেখে ছবি তুলতেন ফ্রান্জ অস্টেন নামের একজন জার্মান চিত্রপরিচালক। অশোককুমার তখন তরুণ নায়ক। লেখকের ভাষায়, “বোম্বে টকিজ ছিল তখন সর্বজাতির জগন্নাথ-ক্ষেত্র; ইংরেজ-জার্মান- বাঙালি-মাদ্রাজি-গুজরাতি-মারাঠি-পাঞ্জাবি-পার্সি, কেউ বাদ পড়েনি।”

তা, এই বোম্বে টকিজে চাকরি নেওয়া, সেখাকার কাজের ধরন, প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বিভিন্ন মানুষের টুকরো টুকরো কহিনী এবং কিছু ঘটনার বৃত্তান্ত নিয়ে লেখা চলচ্চিত্র প্রবেশিকা'। লেখাটির রচনাকাল ১৯৬৪। আগের ঘটনার স্মৃতিনির্ভর রচনা। লেখাটি লেখকের জীবদ্দশায় 'রঙীন নিমেষ'-শীর্ষক গল্পসংকলনভুক্ত হয়েছিল।

শরদিন্দু পুনায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন ১৯৫২ সাল থেকে। 'হৃৎকম্প' কাহিনীর রচনাকাল ১৯৬৪। লেখাটি ১৯৬৬ সালে 'জলসা' পত্রিকার পূজাসংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এ-কাহিনী লেখকের 'হৃৎপিণ্ড সামান্য রকম জখম' হওয়ার ব্যক্তিগত রচনা। রচনার শেষে লেখক নিজেই লিখেছেন—"আমার যে আত্মজীবনী কোনওদিন লেখা হবে না, এই বিবরণী তারই ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ।"

ওপরের দুটি রচনা গল্প নয়, স্পষ্টতই আত্মকথা কিংবা আত্মকথার বিচ্ছিন্ন বা স্বয়ংসম্পূর্ণ দুটি অংশ। গল্পের মতো সুখপাঠ্য, তবে এ দুটিকে ছোটগল্পের সারিতে রাখা যায় না। লেখকের জীবদ্দশায় গল্পগ্রন্থভুক্ত হয়েছিল, কিন্ত তার পেছনে অন্য কোনও কারণ থাকা অসম্ভব নয়—বিশেষ করে লেখক তখন প্রবীণ এবং প্রবাসী।

মৃত্যুর পরে শরদিন্দু যে 'সমাদর' পাচ্ছেন, জীবদ্দশায় তার এক পঞ্চামাংশও তাঁর জোটেনি। সুতরাং অন্যের স্বেচ্ছাচার বা স্বাধীন ইচ্ছার কিছু দায়ভাগ হয়তো তাঁর ওপর এসে পড়েছে। প্রকাশন-সংস্থা পাঠকদের এই সংশয় দূর করে ভবিষ্যৎ কোনও মুদ্রণে 'চলচ্চিত্র প্রবেশিকা' ও 'হৃৎকম্প'কে লেখকের ব্যক্তিগত রচনার, পঙক্তিতে স্থান দেওয়ার কথা বিবেচনা করতে পারেন।

গল্পসংগ্রহভুক্ত 'শাদা পৃথিবী' গল্প কি না তা নিয়ে লেখকের নিজেরই সংশয় ছিল। শরদিন্দু জানিয়েছেন, "শাদা পৃথিবী রচনাটি ঠিক গল্প নয়, উহা আমার মনের উপর আণবিক বোমার প্রতিক্রিয়া। রচনাটি পড়িয়া পাঠকের মনে হইতে পারে, উহা অবান্তর। পাঠককে স্মরণ রাখিতে বলি যে, আণবিক বোমা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যজাতির জীবনের ধারা পরিবর্তিত হইয়াছে। অতীতের সহিত তাহার ধারাবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হইয়াছে। আমরা অকস্মাৎ এক সম্পূর্ণ নূতন ও অপ্রত্যাশিত পরিবেশের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছি। মানুষ যেদিন প্রথম কৃষি আবিষ্কার করিয়াছিল সেদিনও তাহার জীবনের ধারা এমনি অকস্মাৎ মোড় ঘুরিয়া গিয়াছিল। তফাৎ এই যে, কৃষি মানুষের জীবন-সম্ভাবনাকে বাড়াইয়া দিয়াছিল। আণবিক বোমা করিয়াছে ঠিক তাহার বিপরীত। শাদা পৃথিবী আষাঢ়ে গল্প নয়, ভবিষ্যৎবাণীও নয়, ইহা আশঙ্কাসঞ্জাত সতর্কবাণী।"

'শাদা পৃথিবী' ডায়েরির ফর্মে লেখা। ঘটনাবিন্যাসের প্রথম তারিখ ৬ আগস্ট ১৯৪৬। শেষ তারিখ ১৯৫০-এর ৬ আগস্ট। শ্বেতাঙ্গ বিজ্ঞানী 'শাদা মানুষদের মুক্তিপথ' খুঁজে পেলেন।।ওই আবিষ্কারের কিছুকাল বাদে অজ্ঞাত কারণে আণবিক বোমার বিস্ফোরণে নবনির্মিত একটি নিগ্রো স্টেট নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। 'করাল মৃত্যুর বিষ অবশেষে কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, লাহোরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। কাহিনীর শেষে মৃত্যুবিষ আবিষ্কারক বিজ্ঞানী সংবর্ধনার জবাবে জানালেন যে, "যে যোগ্য সেই বাঁচিয়া থাকে, যে অনধিকারী তাহার বাঁচিবার দাবি নাই। প্রকৃতির দরবারে আমাদের শ্বেতজাতির বাঁচিয়া থাকিবার দাবি মঞ্জুর হইয়াছে—সাদা ছাড়া অন্য রঙের একটি মানুষও বেঁচে ছিল না পৃথিবীতে। কিন্তু শ্বেতজাতির আকাঙক্ষা পূর্ণ হল না। হঠাৎ সেই বিজ্ঞানী ধরাশায়ী হলেন। দেখা গেল তাঁর দেহে প্রাণ নেই। এ কাহিনীর শুরু বিগ বেনের মন্দ্র-মন্থর তিনটি ঘন্টার শব্দে, কাহিনীর শেষেও তিনটি ঘন্টাধবনি।

কাহিনীটিতে লেখক গল্প বলতে চাননি, কিন্তু পাঠক হিসেবে এটিকে আমার গল্প বলে মেনে নিতে কোনও অসুবিধে হয়নি। আণবিক বোমা বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়ায় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের,স্পর্শকাতর কবি-লেখকদের কলম থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু গল্প-কবিতা বার হয়েছিল। এই গল্পটি সেইসব সৃজনধমী রচনার পাশে স্থান পাওয়ার যোগ্য। তবে গল্পটি পড়তে পড়তে আমার পরশুরামের 'গামানুষ জাতির কথা'-শীর্ষক গল্পটির কথা মনে পড়ে গিয়েছিল।

পরশুরামের এই গল্পটির প্রকাশ ১৩৫২ সালে। শরদিন্দুর 'শাদা পৃথিবী'র প্রকাশকাল এক বছর বাদে, অর্থাৎ ১৩৫৩ সালে। পরশুরামের গল্পে বড় বড় রাষ্ট্রের প্রভুরা 'বজ্জাত বিপক্ষ গোষ্ঠীকে' একেবারে নির্মূল করার জন্যে পরস্পরের প্রতি অ্যানাইহিলিয়ম বোমা ছুড়লেন। কিন্ত সব রাষ্ট্রপ্রভু একসঙ্গে এই কাজটি করার ফলে সমগ্র মানবজাতিই ধ্বংস হয়ে গেল। গামা-রশ্মির প্রভাবে সহজাত প্রখর বুদ্ধি নিয়ে মানুষের জায়গা দখল করল ইঁদুররা। ওদের চেহারাও মানুষের মতো হয়ে উঠল। লেখক লিখেছেন, "এই গামা-রশ্মির বরপুত্রগণকে গামানুষ বলব"। মানুষের সব দোষ-গুণই পেয়েছিল গামানুষরা। এদের মধ্যেও ছিল জাতিভেদ, সাদা-কালোর ভেদ, রাজনীতির তেদ, দ্বেষ-হিংসা এবং যুদ্ধবিগ্রহ। শেষে 'শান্তিস্থাপক বোমা'র কলাণে মানুষদের মতো গামানুষরাও নিশ্চিহ্ন হয়েছিল।

গল্পের শেষে পরশুরাম লিখেছেন, "মৃতবৎসা বসুন্ধরা একটু জিরিয়ে নেবেন তারপর আবার সসত্ত্বা হবেন। দুরাত্মা আর অকর্মণ্য সন্তানের বিলোপে তাঁর দুঃখ নেই। কাল নিরবধি, পৃথিবীও বিপুলা। তিনি অলসগমনা, দশ-বিশ লক্ষ

বৎসরে তাঁর ধৈর্য্যচ্যুতি হবে না, সুপ্রজাবতী হওয়ার আশায় তিনি বার বার গর্ভধারণ করবেন।”

এই দুটি গল্পের একটিই প্রতিক্রিয়া—আণবিক বোমার বিস্ফোরণ। একটি গল্পে সাদা ছাড়া অন্য সব রঙের মানুষ আণবিক বোমার বিস্ফোরণে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল, শেষে শুরু হয়েছিল শ্বেতজাতির পতন। অন্য গল্পটিতে ওই বোমার আঘাতে সমগ্র মানবজাতি বিনষ্ট। গামা-রশ্মির প্রভাবে সৃষ্ট গামানুষরাও ধবংস হল অবশেষে। আণবিক বোমার প্রতিক্রিয়া দুই লেখকের মোটামুটি একই ধরনের। কিন্তু গল্পদুটির অন্তার্নিহিত সত্য যাই হোক না কেন, প্রকরণে এবং বয়নে একটি গল্পের সঙ্গে আর একটি গল্পের দূরত্ব বেশ খানিকটা।